# মুযাকারা - সহশিক্ষা

আলোচ্য বিষয়

- পর্দা
- সহশিক্ষা কি, কেন হারাম
- বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মেডিকেলে অধ্যয়নরত এক বোনের জবান থেকে "মেডিকেল সেক্টর আসলে কেমন?"

কিছু জরুরী প্রশ্নের উত্তর:

- পর্দা করে কি মেডিকেল পড়া সম্ভব?
- মেয়ে ডাক্তার কম, রোগী দেখানোর সময় মেয়ে ডাক্তার পাই না!
- নিজে মেডিকেলে পড়াশোনা করে গিয়ে অন্যদের গুনাহ থেকে বাঁচানো।
- বর্তমানে মেয়েরা কিভাবে তাহলে ডাক্তার হবে?
- বড় বিপদ ঠেকাতে ছোট বিপদ মেনে নেয়া।
- নিজে ঠিক থাকলে সব ঠিক, মেডিকেলে ফ্রি মিক্সিং এর মাঝে নিজেকে ঠিক রাখতে পারাটাই আসল দ্বীনদারিতা।
- একজনের পর্দা নষ্ট করে কতজনের পর্দা রক্ষা করতে পারবে! কত সওয়াব!
- দ্বীনদার মেয়েরা মেডিকেল সেক্টর থেকে যদি চলে আসে তাহলে মেডিকেল তো পুরুষ, অমুসলিম বা বেদ্বীন ডাক্তার দ্বারা ভরে যাবে!
- বেশিরভাগ ডাক্তার ও তো দ্বীনদার হয় তাহলে ওরা কি ভুল? ওরা কি কম বুঝে?
- শুধু ৫ টা বছর পড়ে এম.বি.বি.এস টা করে নাও, চাকরি করতে হবে না।
- সেবা যখন উদ্দেশ্য ফিতনার আশঙ্কা এমনিতেই কমে যাবে।
- নববী যুগে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত সাহাবীদেরকে কি মুসলিম মেয়েরা চিকিৎসা দেন নি?
- আয়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা ডাক্তার ছিলেন।
- একজন আমাতুল্লাহর সহশিক্ষা ছেড়ে দেয়ার গল্প থেকে (সারনির্যাস)

সহশিক্ষা ছাড়তে চাইলে তৈরী কিছু পরিস্থিতি প্রসঙ্গে:

- পরিবার মানে না, বিয়ে হবে না, ভালো স্টুডেন্ট  ইত্যাদি
- পরিবারকে দাওয়াহ
- দুআ
    - ক্লোজ ইউর আইজ!
    - আমার আল্লাহ না তুমি?
- মাজুর হালত
- বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে শিক্ষা
- সহশিক্ষা ছাড়ার পর করণীয়

بسم الله الرحمن الرحيم

আজকে আমরা কথা বলব খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের অনেকের স্বপ্নের একটা টপিক নিয়ে। সহশিক্ষা যুক্ত পরিবেশে মেডিকেল সেক্টরে যাওয়া নিয়ে। আর যেহেতু দ্বীনদার বোনেরা ভাবেন যে মেডিকেল সেক্টরে কাজ করা মানে অনেক বড় দ্বীনের খিদমাত। কাজেই এই টপিকটা কতটা আহাম, কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি মাপতে চাই আমরা হয়তো কখনোই পুরোটা মেপে শেষ করতে পারব না। তবে আমরা এখানে আপনাকে কোনো মাসআলা বলব না যে আপনি সহশিক্ষায় যাবেন কি না যাবেন বা আপনি মেডিকেলে যাবেন কি না যাবেন। আমরা এগুলো বলার কেউই না। আমরা শুধু আপনাদেরকে বাস্তবিক অবস্থাটা তুলে ধরব ইন শা আল্লাহ। সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে আপনার। ইন শা আল্লহ।

একারণেই বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মেডিকেলের-ই ফাইনাল ইয়ারের একজন ছাত্রীর কাছেই মেডিক্যাল সেক্টরটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো ইন শা আল্লহ।

তবে তার আগে চলুন ছোট্ট একটি ভূমিকায় যাওয়া যাক। একটু পিছনে ফিরে দেখা যাক।

.

সূরা আহযাব। সূরা আহযাবের আমরা ঠিক ৩ টি আয়াতের সারনির্যাস নিয়ে কথা বলব। আয়াত নাম্বার ৩২,৫৩,৫৯। আমাদেরকে বলা হচ্ছে আমরা যদি বাড়ির বাইরে যাই কিভাবে যাবো। আমরা পর্দা বলতে যা বুঝি: হাত মোজা, পা মোজা, কালো বোরখা এই পর্দাটা মূলত সূরা আহযাবের ৫৯ নাম্বার আয়াতে বলা আছে। যেখানে বলা হচ্ছে যে আমরা পুরো দেহ আবৃত করার পর মাথার দিক থেকে মুখমন্ডল আবৃত করে নিব। আর চলাফেরার সুবিধার্থে একটু চোখ খোলা রাখব। এটা কিন্তু আমাদের কথা না। এই আয়াতের তাফসীর থেকেই নেওয়া মূলনীতি। এবার ধরুন আমি বাড়ির বাইরে বের হবো। প্রথমত, আমি কখন বের হবো? আমার কোনো প্রয়োজনে। এমন প্রয়োজন যেটাতে শরীয়ত আমাকে অনুমতি দেয়। এবার আমি বের হলাম, বের হবার পরে কোনো গায়রে মাহরামের সাথে আমার কথা বলতে হলো। এবার আমাকে দুটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আয়াত ৩২, আয়াত ৫৩, সূরা আহযাব। প্রথমত এই কথা বলাটা হতে হবে পর্দার আড়াল থেকে।

আমরা যদি কওমি মাদ্রাসা গুলো দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারব এই আড়ালটা আসলে কেমন হয়। ছবিটা দেখুন।

এই যে দেখুন, এখানে সুন্দর করে কালো পর্দা দেয়া থাকে। পুরুষ উস্তাযরা যখন ক্লাস করান, তখন পর্দা এমন দেয়া থাকে। পুরুষ উস্তাযরা পর্দার একপাশে থাকেন, অন্যপাশে বোনেরা। এমন সীমায় থেকে আমি গায়রে মাহরামের সাথে কথা বলতে পারব আমরা, তাও শুধু জরুরতে। আর সূরা আহযাবের ৩২ নং আয়াতে বলা হচ্ছে আমি যেন কন্ঠের পর্দা করি। কোমল কন্ঠে যেন কথা না বলি, এমন কন্ঠে যেটাতে গায়রে মাহরাম আমার প্রতি আকর্ষণবোধ করবে। এই কথা বলাটা কতটুকু হবে? প্রয়োজনমাফিক।

এবার আমরা একটা নতুন টার্ম সম্পর্কে জানবো, 'কো এডুকেশন বা সহশিক্ষা'।

সেই যে ৪/৫ বছর বয়সে আপনি স্কুলে গেলেন কখনো কি  এইভাবে পর্দার আড়াল রেখে আপনার স্কুলে পাঠদান হয়েছিল? হাই স্কুলে গেলেন, কলেজে গেলেন, ভার্সিটিতে গেলেন। হয়েছে? নাহ। আপনি বরাবর দেখে এসেছেন সেই পরিবেশে ছেলে মেয়েরা একসাথে মেলামেশা করছে। এই অবাধে মেলামেশাকে বলা হয় " ফ্রি মিক্সিং " এটাও হারাম। আর এই ফ্রি মিক্সিং থাকে বলেই এই যে একসাথে শিক্ষা গ্রহণ, এই সহশিক্ষাটাকেও হারাম বলা হয়। সহশিক্ষা হারাম এ বিষয়ক প্রমাণ বা রেফারেন্স আপনি যেকোনো স্থানে খুঁজলেই পেয়ে যাবেন ইন শা আল্লহ।

আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত কোনো আলেম এবং এমনকি সাধারণ মানুষেরও সহশিক্ষাকে হালাল বলার বদহিম্মত হয় নি।

সহশিক্ষা হারাম। সহশিক্ষা হারাম। সহশিক্ষা হারাম।

আপনি যেকোনো জায়গায় প্রশ্ন করে দেখতে পারেন। যেকোনো জায়গায়। ইন শা আল্লাহ হালাল পাবেন না। এভাবে গায়রে মাহরামের সাথে একত্রে অবস্থান করে শিক্ষাগ্রহণ করা ছেলেদের জন্য ও হারাম, মেয়েদের জন্য ও হারাম।

আমরা একটা চমৎকার ছবি দেখাই। ছবিটা প্রাণী বিদ্যা ক্লাসের। ১৯৪৬ সালের।
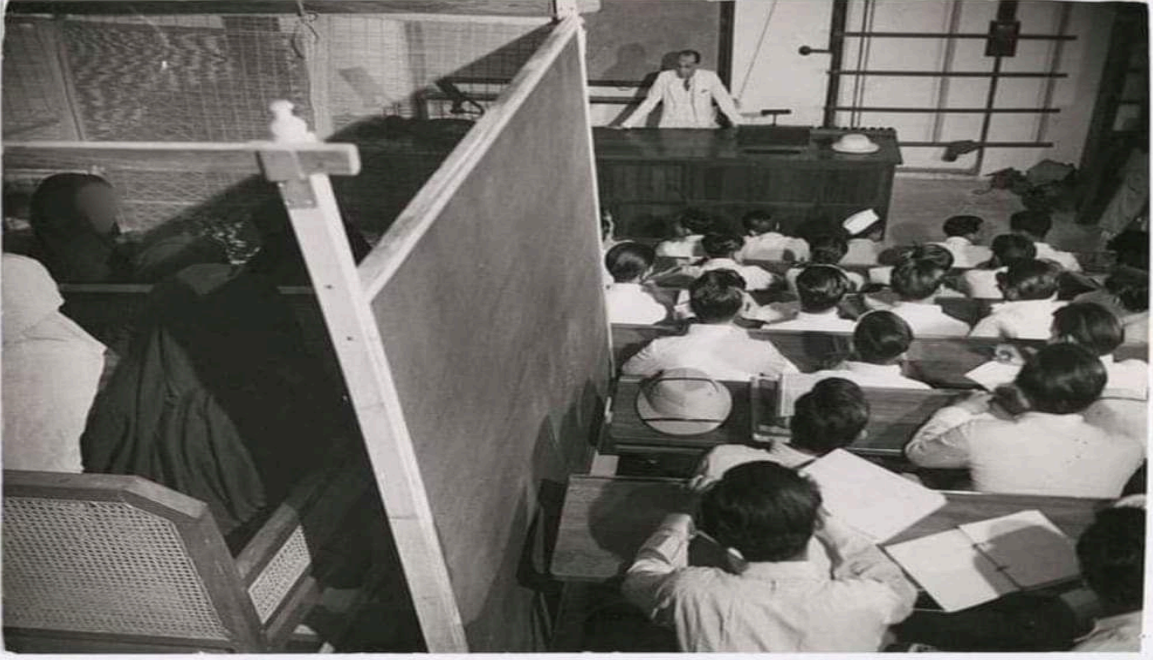
এইখানে দেখা যাচ্ছে টিচার ক্লাস নিচ্ছে। ভাইয়েরা ও আছে, বোনেরা ও আছে। একটা সীমারেখা দেয়া আছে, ঐযে কওমী মাদ্রাসায় যেটা হয় দেখিয়েছিলাম অনেকটা ঐরকম তাই না.? এটাকে আমরা বলতে পারি সহশিক্ষামুক্ত একটি ক্লাসরুম। এধরনের ক্লাসরুমে জরুরতে, জরুরি বিষয়ে পড়াশোনার অনুমতি অবশ্যই শরীয়ত দেয়। যেমন ধরুন মেডিকেল পড়াশুনা, এটা জরুরি নিঃসন্দেহে। এখন কথা হচ্ছে এই যে পরিবেশ দেখলাম, খুব চমৎকার পরিবেশ। যে পরিবেশে পড়াশুনা করা জায়েজ। এই পরিবেশ কি আমাদের ভার্সিটিতে

আছে? মেডিকেলগুলোতে আছে? আমাদের মেডিকেল সেক্টরগুলো আসলে কেমন?

এই সেক্টরটি সম্পর্কে আদ্যোপান্ত জানতেই চলুন এবার যাই আমাদের মেডিক্যালে পড়ুয়া সেই বোনের কাছে।

স্পিকার বোন: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

মেডিক্যালে পড়ুয়া বোন: ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আপু।

স্পিকার বোন: তাহলে উখতি বিসমিল্লাহ করি।

মেডিক্যালে পড়ুয়া বোন: হামদ ও দরুদের পর।

মেডিকেল আসলে আমাদের জন্য একটা স্বপ্নের নাম। তবে এখন আমার কাছে ফেসিনেশন[1] মনে হয়। কিন্তু আগে এটা স্বপ্ন ছিল। বর্তমানে দুঃস্বপ্ন হয়ে গেছে আর কি! তো আমরা যারা এখন বর্তমানে মেডিকেলে আছি। যারা দ্বীন হালকা পাতলা বুঝি। আল্লাহ বুঝার তৌফিক দিয়েছেন। তাদের কাছে এটা গলার কাঁটা হয়ে গিয়েছে। না পারছি গিলতে, না পারছি ফেলে দিতে। তো আমার জার্নিটা আজ আমি যতটুকু সম্ভব বলার চেষ্টা করব। এখানে এত বেশি গুনাহ। এত বেশি এক্সপোজার[2] যেটা হয়তো কম সময়ে আমার দ্বারা সব তুলে ধরা পসিবল না। আমার দ্বারা বলা যতটুকু সম্ভব আমি ইন শা আল্লাহ বলব।

আমার ইন্টারমিডিয়েট চলাকালীন কলেজে একজন ডাক্তার আপু এসেছিলেন। আমাদের কলেজ থেকে পাশ করেছিলেন। উনার নরমাল একটা বোরকা পরা ছিলেন সাথে মাস্ক বা নিকাব করা ছিল। আমার ঠিক খেয়াল নেই। ওইদিন ওই আপুকে দেখার পরে আমার মনে হয়েছিল যে (তখন আমি পর্দা করতাম না,

---

[1] মুগ্ধতা

[2] প্রকাশ

এতকিছু জানতাম না। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন) আপুটা এত ভালো। এত সুন্দর করে মা শা আল্লাহ পর্দা করে এসেছেন, এখানে এসে বলছেন। তখন থেকেই আমার মেডিকেলের প্রতি ভালোবাসা হয়েছে। ধীরে ধীরে টান টা বেড়েছে। আর বাবা মার একটা ইচ্ছা ছিল আমাকে ডাক্তার বানাবেন। আমাদের গ্রামে তেমন ভালো ডাক্তার নেই। মানে বাবা-মা যেমন বলেন। সমাজের সেবা। আমাদের জন্য সেটা উম্মতের খিদমত হয়ে গেছে। তো আমার আল্লাহর রহমতে হলো একটা মেডিকেলে। এডমিশনের আগের তিন মাস যে আমরা কি পরিমান পড়াশুনা করি, কি পরিমান দুআ করি! তখন যেহেতু জাহিল ছিলাম , জানতাম না এসবের পরিবেশ। এসব নিয়ে এতটা কন্সার্ন্ড ও ছিলাম না। আমি যে জায়গা থেকে এসেছি সে জায়গার সবাই একটু কনজারভেটিভ বলা যায়। এখনকার সমাজে যে পরিমাণ বেহায়াপনা ছড়িয়েছে তখন আসলে এতটা ছিল না। আমি এডমিশনের সময়ে এতটা ছিল না যেখানে আমি থাকতাম। কিন্তু এখানে আসার পরে যা দেখছি সেটা দ্বীনদার বা প্র্যাক্টিসিং আপুর ক্ষেত্রে কেমন হবে এটা তো বলবই না ; আমার নিজেরই গা রিরি করে আসত ' এগুলো এখানে কি হচ্ছে '। অন্যান্য দিক যেগুলো ভার্সিটি বা অন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই দেখবেন আপনি, সেগুলো রেখে যদি পড়াশুনার দিক নিয়ে বলি। প্রথমে হচ্ছে এনাটমি (আমার সিলেবাস এটা ছিল), ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি। তো এনাটমিতে হিউম্যান বডি সম্পর্কে বেসিক নলেজ দেয়া হয়। তো আমাদের হাড়, কিডনি এসব ধরে ধরে শিখতে হয়। তো এখানে ক্যাডাভার বা ডেড বডি থেকে শিখতে হয়। আমাদের এখানে পুরো ব্যাচের জন্য তিনটা বডি ছিল। আমাদের ছিল মেইল বডি। এগুলো অনেক আগে থেকেই ফরমালিনে থাকে, আলটিমেটলি চেহারা এত বুঝা যায় না। এটা তো দেখা যাচ্ছে এটা আসলে ফিমেইল বডি। আমি আসলে

তখন ভাবিনি এইভাবে একটা ফিমেইল বডি দিয়ে দিবে। আমার একজন ব্যাচমেট আপু বলছিল আমাদের তো ফিমেইল বডি ছিল। আমি এত অবাক হয়েছিলাম ফিমেইল বডি মানে। ফিমেইল বডি কিভাবে দেয়? ও বলছিল হ্যা ফিমেইল বডি ছিল। আমি বলতেছিলাম তোমরা এগুলো দেখেছ? ও বলছিল প্রথমে একটু খারাপ লাগতো কিন্তু দেখতে তো হবে, জানতে হবে। তো এখানে দেখা বলতে আপু প্রথমে আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী চেস্টের পার্ট থাকে। চেস্টের পার্ট এ কি থাকে সেগুলো তো আমরা জানি। এটা আজ পর্যন্ত আমি ভুলতে পারি নি যে এতগুলো ছেলে মেয়ে একসাথে দাড়িয়ে আছে, একটা স্ট্রেচার এর লেন্থ কতটুকু হয়। একটা ৬/৭ ফিট এর স্ট্রেচার এর সামনে এতগুলো ছেলে মেয়ে একসাথে দাঁড়ানো। ওইখানে আমার ও তো হয়েছে কয়েকবার টাচ লেগে গেছে, ধাক্কা লেগে গেছে। জায়গাটা এত কনজেসটেড[3] থাকে যে কোনোভাবেই পসিবল না ছেলেদের টাচ থেকে নিজেদের বাঁচানো।

ক্যাডাভার এর এই জায়গাটা থেকে কোনো ভাবে বাঁচানো সম্ভব না। এখানে গুনাহ হচ্ছে। তারপর ভাইভা, এখানে আইটেম বলে। প্রতিদিনই আইটেম হয়। আমার তখন এসব বুঝ ছিল না, তো আমি নরমাল বুরকা হিজাব পড়ে যেতাম। আমাদের গ্রুপে দুই একটা মেয়ে ছিল যারা হচ্ছে ভালোমত পর্দা করতো মা শা আল্লাহ। তো তাদেরকে টিচাররা (ফার্স্ট ইয়ারে ফিমেইল টিচারই ছিলেন আমাদের) অনেক হীনমন্যতার মধ্যে ফেলে দিছিল যে তোমরা এসব কি করছ, প্রফের সময় কি করবা, এখন থেকে অভ্যাস কর। অনেক বেশি ফোর্স করা হতো তাদেরকে। আমার যতটুকু মনে পড়ে প্রথম বর্ষেই তারা নিকাব খুলেছিল। তো ওইখানে তো ছেলেরা ও ছিল। ফার্স্ট ইয়ারেই পর্দা চলে যাবে। তবে একইরকম

---

[3] ভিড়

যে সব জায়গায় হবে , আমি যেটা বলছি সেটা না। কোনো মেডিকেলে হয়তো কম হচ্ছে, কোনো মেডিকেলে বেশি হচ্ছে। কারো ভাগ্য ভালো থাকে। আমার অবস্থা কেমন হবে সেটা তো আমি বলতে পারব না, ওই সিচুয়েশন ফেস করার পরে বলতে পারব যে আমার সাথে এমন হলো। তো ভাইভাটা এমন যায়। এরপর করোনার সময় চলে আসে। বাসায় চলে যাই। ধীরে ধীরে তখন বুঝি, শেখার চেষ্টা করি। আল্লাহ যখন এই বুঝটা আমাকে দিলেন পর্দা করতে হবে। তখন আমার মাথায় এটা আসে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তো মেডিকেলে চলেই এসেছি। আমার আগে ইচ্ছা ছিল সব ধরনের রোগী দেখব। এখন আমি আর সব রোগী দেখব না। শুধু ফিমেইল রোগী দেখব। সবাইকে আমি আগে বলে বেড়াতাম আমার কারণে মেয়েদের সুবিধা হলে তো আমারই সওয়াব, আমার না হয় একটু কষ্ট হচ্ছে। সেকেন্ড ইয়ারে যখন আমার প্রফ আসে তখন মাস্ক ইউজ করা যেত। তখন ঈমানের হালত খারাপ ছিল। নিকাব এর নিচে মাস্ক পরে পার করে ফেলেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ্।

তারপর থার্ড ইয়ারে ফরেনসিক অটপসি ছিল, যেটাকে আমরা ময়না তদন্ত বলি। এখানে হয় কি, একটা বডি থাকে, সেটা স্ট্রেচার এ দেয়, ডোম এসে একটানে জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। শরীরটা পুরো নগ্ন করে ফেলে। পর্দা, লজ্জা, সম্ভ্রম সবই যেন অসহায়। তারপরেই গলা থেকে নাভির নিচ পর্যন্ত একটানে দুইভাগ করে দেয়। জীবিত অবস্থায় হয়তো একজন মহিলার দিকে কেউ তাকানোর সাহস ও পেত না, অথচ এখানে নিথর দেহ পুরো নগ্ন হয়ে পড়ে আছে।

এটা কেমন না বোনেরা? যে আপনার সামনে স্যার ম্যাডাম আছেন, অনেক ছেলে মেয়ে আছে সেখানে একটা মেয়েকে এমনভাবে রাখা হচ্ছে। সে হয়তো মারা

গেছে কিন্তু আপনার তো হায়া আছে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে আপনার হায়াটুকুও শেষ হয়ে যায় l থার্ড ইয়ারে আমাদের ওয়ার্ড থাকে। অটিতে স্যার ম্যাডাম, দাদুরা, ফিমেইল নার্স, মেইল নার্স সবাই অটি টেবিলের পাশে আছে, আমরা ও আছি। ওইখানে হয় কি দাদুরা ক্যাথেটার (মূত্রনালীতে টিউব ঢুকানো) করে দেয়। ওইখানে ওই কাজ দাদুরাই করে মেয়ে হউক বা ছেলে। এরপর ধরুন কোনো একটা রোগীর চেস্টের(বুক) পার্ট এ প্রবলেম হয়েছে। তখন তার ওই পার্ট এক্সপোজ হচ্ছে। সবাই মিলে দেখছে। আমাদের ব্যাচে ছেলেরা তো এগুলো এনজয় করত। তো যার সাথে হচ্ছে এগুলো, উনি তো সেন্সলেস হয়ে আছেন। দেখছেন না কি হচ্ছে। আমরা তো দেখছি। চোখের হায়া বলতে তো কিছু থাকেই না। তারমধ্যে ঘেষাঘেষি। হুটহাট করে দেখা যায় কারো না কারো গায়ের সাথে লেগে যাচ্ছে l কারো কোনো তোয়াক্কা নাই। তার মধ্যে ইম্পর্ট্যান্ট সার্জারি। কে খেয়াল রাখবে এসব! সেদিন থেকেই আমার সার্জারীর প্রতি ইচ্ছা চলে গিয়েছিল। তার উপর রমাদানের টাইম ছিল, আমার আমলের অবস্থা খারাপ ছিল। ফ্যামিলিকে পর্যন্ত ফোন দিতে পারি নাই এতবেশি ব্যস্ত ছিলাম। তো তখন আম্মুকে গিয়ে বললাম " আম্মু সার্জারি তো মেয়েদের জন্য না, অন্তত আমি পারব না। " সেদিন আম্মু অনেক কষ্ট পাইছিলেন। আমাদের গার্ডিয়ান তো জানেন না এখানের পরিবেশ কেমন। তো থার্ড ইয়ার গেল। থার্ড ইয়ারে আমার গ্রুপ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমি নিকাব করতাম। অন্য গ্রুপে নিকাবি কোনো মেয়ে ছিল না। ছেলেগুলো আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল। এটা একটা ঘটনা। এরপর শুনেছিলাম ভাইভাতে নিকাব নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, স্যার নাকি নিকাব খুলাচ্ছে। এরপর আমি রুমে আসলাম, মাস্ক ও পরে গিয়েছি। এরপর স্যার বলেন এটা খোলো, এটা খোলোন। তো ম্যাডাম বলেন এটা তো

মাস্ক না, ও নিকাব পরে আছে। তারপর ফোর্থ ইয়ারে তো আমাদের যে স্যার ছিলেন, আমাদের দুইটা ক্লাস থাকতো। উনি আমাকে প্রতিদিন টার্গেট করে রেখেছিলেন। অনেক অপমানিত হয়েছি আমি। আমার ফোর্থ অনেক কষ্টের সাথে পার হয়। আমি অনেক দুআ করেছি এই বলে যে আল্লাহ আমাকে বাঁচান। তো আমি প্রফে বেঁচে গিয়েছিলাম কিন্তু আমার আরেকটা ফ্রেন্ড অন্য মেডিকেলের তাকে নিকাব খুলতে হইছে। তাদের কাউন্সিলিং করা হয়েছে যে তোমরা মাস্ক নিকাব খুলে ভাইভাতে ঢুকবে। আমার ফ্রেন্ড এত কান্না করছে। তো ওকে খুলতে বলছে। লাস্ট যে প্রফ দিলাম তিনটা ভাইভার তিনটা বোর্ডে এই নিকাবের জন্য আমাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। এরপর ওয়ার্ডে আপনাকে রোগীর শরীরে হাত দিতেই হবে। পুরুষ রোগী আসছে আপনাকে তার শরীরে হাত দিতে হবে। অবশ্যই হাত দিতে হয়। এরপর হার্নিয়া (প্রাইভেট পার্ট স্পর্শ করা), ডি আর ই (পায়ুপথে আঙ্গুল ঢুকিয়ে) চিকিৎসা করা। আপুরা কেমন গা ঘিনঘিন করার মতো না? এটা তো শরীয়তে জায়েজ না যে বিপরীত লিঙ্গের কারো প্রাইভেট পার্ট এ চিকিৎসা করব। এরপর গাইনিতে, সেখানেও পর্দার তোয়াক্কা নেই। এরপর স্যারদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। প্রথমে আমি অনেক রিয়েক্ট করতাম, আমার অস্বস্তি লাগতো। এরপর ধীরে ধীরে নরমাল হয়ে যায়। মেডিকেলে এমনি হয়। হারামে থাকতে থাকতে সেটা নরমাল হয়ে যাবে। এখানে আরও দুটো বিষয়, থার্ড ইয়ারে স্টাডি ট্যুর আর সফরের দূরত্বে একটা ট্যুর হয়। আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় এজন্য, আমরা যে যাব না। আকারে ইঙ্গিতে মিথ্যা ও বলতে হয়।।

একে তো মাহরাম ছাড়া সফর করা তো হারাম। আর এগুলো নামে স্টাডি ট্যুর হলেও নাচ, গান ইত্যাদি নানান হারাম কাজ হয়। কিন্তু স্টাডি ট্যুরে মার্কস

থাকে, একেক মেডিকেলে একেক রকম হয়। এরপর ইন্টার্নশিপ। এখানে তো কোনোভাবেই লুকিয়ে থাকতে পারবেন না। এখানে প্রতিদিন জয়েন করতে হয়। ওইখানে গেলে পর্দার কিছুই থাকে না। ছেলেদের সাথে, ভাইয়াদের সাথে, রোগীদের সাথে কন্টিনিউয়াস কথা বলতেই হবে। ঐ সময় আমল, ঈমানের কিছুই থাকে না। আমার তো এখন-ই কিছুই নাই। মার্কিং করতে হলে মাইনাস এ নিয়ে যাব।

আরেকটি মজা এবং একইসাথে দুঃখজনক বিষয় বলি? যারা প্রপার দ্বীন মানে তারা বিয়ে করতে চায় না মেডিকেলের মেয়েদেরকে।

এরপর সলাতের ক্ষেত্রেও হিমশিম খেতে হয়। নামাজ নিয়ে এত সমস্যা হয়! কত কত নামাজ কাযা হয়ে যাচ্ছে।

এরপর পোস্ট গ্রেজুয়েশন। এতগুলো যা শুনলেন তার থেকে আরো বাজে অবস্থা। মেডিকেলের পড়াশোনার বিষয়টি ই এমন যে সারাজীবন পড়তে হবে। এখানে থেকে পরিবারের হক যথাযথ আদায় কখনোই পসিবল না। একজন মুসলিমার পরিবারে যতটুকু টাইম দেয়া দরকার সেটা হবে না। এরপর বিসিএস। সেখানে তো নিকাব সম্ভবই না। অথচ বিসিএস ছাড়া তো কোনো দাম ই নেই এই সেক্টরে। আরও কিছু বিষয় আছে। সেগুলো ইন শা আল্লহ প্রশ্নোত্তরে পেয়ে যাবেন। চলুন, এবার তাহলে প্রশ্নতে চলে যাই।

স্পিকার বোন:

প্রশ্ন - পর্দা করে কি মেডিকেল পড়া সম্ভব?

জবাব - আমরা এতক্ষণ আমাদের মেডিক্যাল পড়ুয়া বোনের কথা শুনলাম না? এর প্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের উত্তর আপনারাই দিন ইন শা আল্লাহ। সব উত্তর কি আর শিখিয়ে দিতে হয়?

মেডিক্যাল পড়ুয়া বোন:

প্রশ্ন - মেয়ে ডাক্তার কম। রোগী দেখানোর সময় মেয়ে ডাক্তার পাই না।

জবাব - সব জায়গায় মেয়ে ডাক্তার আছে কিন্তু কয়েকটা সেক্টরে জাস্ট মেয়ে ডাক্তার কম। ওই সেক্টরগুলোতে খুঁজে বের করা একটু কঠিন কিন্তু কষ্ট করে খুজে বের করা যাবে। ইন শা আল্লহ।

স্পিকার বোন:

প্রশ্ন - নিজে সেখানে গিয়ে অন্যদের গুনাহ থেকে বাঁচানো

জবাব - আমি যদি মেডিকেল সেক্টরে না যাই তাহলে অন্য বোনেরা তো যাবেন। ইভেন আমরা এটা ভাবি দ্বীনদার নারীরা যদি মেডিকেল সেক্টরে না যায় তাহলে নন প্র্যাক্টিসিং মুসলিম ইভেন অমুসলিম তারা যাবে। তাদের তো গুনাহ হবে।

আমি বলি, যদি আপনি খুব সুন্দর করে নিজেকে ধোঁকা দিতে চান তবে এই প্রশ্নটা নিজেকে করুন। দেখুন প্রথম কথা আপনি একজন আমাতুল্লাহ যদি মেডিকেলে যদি যান তবুও বাংলাদেশের প্রতি ১০০ জনে ৬০-৬৫ জন মেয়ে প্রত্যেক বছর যাবে। আপনি এক আমাতুল্লাহ যদি মেডিকেল বয়কট করেন তবুও বাংলাদেশের প্রতি ৬০-৬৫ ভাগ মেডিকেল স্টুডেন্ট হবেন নারী। দ্যাটস মিন আপনি গেলেও মানুষ গুনাহতে যাচ্ছে, আপনি না গেলেও গুনাহতে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি না গেলে কি হচ্ছে আপনি জাহান্নাম থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন। আর ঠিক কোথায় আছে বলুন, আমি জাহান্নামে গিয়ে কিন্তু হাজারো মানুষকে জান্নাতে পাঠাবো। এরকম কোনো কিছু কি ইসলামে পাওয়া যায়?

প্রশ্ন - বর্তমানে মেয়েরা কিভাবে তাহলে ডাক্তার হবে?

জবাব - এটা আসলে এমন প্রশ্ন যেটার উত্তর বলা যায় যে আপাতত কারো জানা নাই। প্রথমত আমাদের বাংলাদেশে সহশিক্ষামুক্ত মাত্র দুটি মহিলা মেডিকেল আছে। এখন আমরা যদি এখানে যাই, প্রথম কথা এগুলো প্রাইভেট যেগুলোর ব্যয় বহন করা কঠিন। তারপরেও ধরুন এগুলোর ব্যয় বহন করে নিলাম। কিন্তু এখানে শুধু স্টুডেন্ট ফিমেইল কিন্তু টিচার বা যে রোগীগুলো দেখবেন যার হার্নিয়া এক্সামের জন্য তার প্রাইভেট পার্ট আপনাকে টাচ করতে হবে তিনি ও মেইল। আলটিমেটলি যাহা বায়ান্ন, তাহাই তেপ্পান্ন আর তাহাই পঁয়ষট্টি হয়ে গেল। তবে হ্যা তুলনামূলক বেটার অপশন উইমেন্স মেডিকেলগুলো। কিন্তু যদি আমরা জরিপে দেখি প্রত্যেক ক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়ে। হিউজ পরিমাণ মেয়েরা মেডিকেলে যাচ্ছে। আমি যদি আমার দ্বীন বাঁচাতে মেডিকেলে না যাই, আমার

ফরজটুকু (পর্দা) বাঁচাতে মেডিকেল সেক্টরে না যাই তাহলে কি আদোও গুনাহ হবে? ফরজের জন্য এতোটুকু কম্প্রোমাইজ কি করা যায় না?

প্রশ্ন - বড় বিপদ ঠেকাতে ছোট বিপদ মেনে নেয়া

জবাব - এখানে ছোট বিপদ বলতে নিজের বেপর্দা হওয়া আর বড় বিপদ বলতে অনেক বোনকে পর্দার খেলাফ হওয়া থেকে বাঁচানো বোঝানো হয়েছে।

খেয়াল করুন, আমি আমাতুল্লাহ যদি মেডিকেলে যাই তারপর ডাক্তার হই এরপর এক হাজার দুই হাজার বোনের পর্দা রক্ষা করতে পারব: এটা আসলে আমাদের মিস কনসেপশন। না জানার কারণে এমন হয়। ধরুন আমি একজন এমবিবিএস ডাক্তার কিন্তু আমার কোনো দাম নাই যদি না আরেকটু বড় ডিগ্রি নিতে পারি। ধরুন আমি আমার বিবাহ, বাচ্চাকাচ্চা কোনো কিছুর হক আদায় করলাম না। আমি শুধু ডিগ্রি নিতে থাকলাম, যেটা আসলে অবাস্তব। এজন্য বড় জায়গায় মেয়ে ডাক্তার একটু কম পাওয়া যায়। তো হক আদায় না করে আমি বড় ডাক্তার হয়ে গেলাম। এখন কথা হচ্ছে আমি একজন পেশেন্ট দেখলাম, তাকে এই এই টেস্ট গুলো করে আনতে বললাম। ঐযে টেস্ট এগুলো কি আমি করে দিব? কখনো না। এগুলো টেকনিশিয়ান করে দিবে। বাংলাদেশের গাইনি সেক্টর বাদে মোস্ট অফ দা টেকনিশিয়ান পুরুষ হয়। আপনাকে টেস্ট করাতে হবে পুরুষের কাছে। আমি ডাক্তার হলাম, আমি আমার পর্দা তরক করে ফেললাম আপনাকে বাঁচাতে অথচ আপনি আমার রেফারেন্স নিয়ে একজন ছেলের কাছে

টেস্ট করাতে যাচ্ছেন। এটা কিভাবে নিজেকে গুনাহের দিকে ঠেলে, ছোট বিপদের দিকে থেকে বড় বিপদ থেকে বাঁচানো হলো? আমি যেখানে একটা ফিমেইল পেশেন্টকে পর্দার খেলাফ থেকে বাঁচাতে পারলাম না, আমি কিভাবে হাজারটা পেশেন্টকে বাঁচাতে পারব। এটা কিভাবে সম্ভব হবে? আর পর্দা করা ফরয। আল্লহ আপনার জন্য শুধু আপনার পর্দা করাটা ফরয করেছেন। অন্যদের পর্দা রক্ষা তো ফরয করেন নি। ফরয তরক কিভাবে ছোট বিপদ?

মেডিক্যাল পড়ুয়া বোন:

প্রশ্ন - নিজে ঠিক থাকলে সব ঠিক, মেডিকেলে ফ্রি মিক্সিং এর মাধ্যমে নিজেকে ঠিক রাখতে পারলে আসল দ্বীনদারিতা বা কৃতিত্ব?

জবাব - এই কথা মূলত গার্ডিয়ানরা বলে থাকেন। আমার ক্ষেত্রেই দেখুন, আমি নিজেকে বা দ্বীনটাকে আসলেই কতটা বাঁচাতে পারছি? আমি তো নিজেকে ঠিক রেখেছি, সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। কখনো পেশেন্ট এর গায়ে হাত দেই না যদি না পরীক্ষায় স্যার হাত দিতে বলে। ছেলেদের সাথে বাধ্য হয়েই কথা বলতে হচ্ছে। আমি তো শত চেষ্টা করেও পারলাম না নিজেকে বাঁচাতে। হারাম পরিবেশে থেকে এই স্পর্ধা কিভাবে হয় আমি ঠিক থাকতে পারব যেখানে চারপাশে ফিৎনা। রুম থেকে বের হলেই হারাম দৃশ্য দেখতেছি। এই কথার কোনো ভিত্তিই নাই যে দ্বীনদারিতা নিজের মধ্যে। যখন আপনাকে অন্য পুরুষদের সাথে গা মিশিয়ে সার্জারী দেখতেই হবে। বাধ্যতামূলক। তখন কিভাবে নিজেকে ঠিক রাখবেন?

প্রশ্ন - একজনের পর্দা নষ্ট করে কতজনের পর্দা রক্ষা করতে পারবে। কত সওয়াব।

জবাব - এব্যাপারটা আগেই বলা হয়েছে। একটা মেয়ের পর্দা রক্ষা-ই যেখানে আমার জন্য কঠিন সেখানে কতজনের পর্দা রক্ষা কিভাবে।

প্রশ্ন - দ্বীনদার মেয়েরা মেডিকেল সেক্টর থেকে যদি চলে আসে তাহলে মেডিকেল তো পুরুষ, অমুসলিম বা বেদ্বীন ডাক্তার দ্বারা ভরে যাবে।

জবাব - দ্বীনদার ডাক্তার আমরা কেন খুঁজি? যাতে সে যেন আমার পর্দার হেফাজত করে। আমার প্রতি সহমর্মিতা দেখায় যাতে আমার পর্দার খেলাপ না হয়। এখানে আলটিমেটলি আগের প্রশ্নের উত্তরটা চলে আসে। এটা করা যাবে না। আমাদের সিস্টেমের দোষ, আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারব না। দ্বীনদার নারী যারা আছে তারাও একটা সময় বের হয়ে যায়। থাকে না। নিজের ফরয তরক হয়। আর সিস্টেমের মধ্যে গিয়ে কখনো সিস্টেম পালটানো যায় না। এ বিষয়ে আসিফ আদনান ভাই হাফি. এর একটি চমৎকার লিখা আছে। আমরা দেখতে পারি ইন শা আল্লহ।

প্রশ্ন - বেশিরভাগ ডাক্তার ও তো দ্বীনি হয়, তাহলে ওরা কি ভুল। ওরা কি কম বুঝে?

জবাব - আচ্ছা,  দাড়ি টুপি, বোরকা নিকাব থাকা মানেই কি সে দ্বীনদার। আমি কি জানি তার বয়ফ্রেন্ড বা গালফ্রেন্ড আছে কি না বা ফ্রি মিক্সিং এ সে অভ্যস্ত কি না। ছেলেদের সাথে কথা বলছে তার কোনো অস্বস্তি কাজ করছে কি না। এগুলো

তো আমরা জানি না। এরকম অনেক দাড়ি টুপি, নিকাব থাকে তাদেরকে আমরা বলতে পারব না দ্বীনদার। হ্যা দ্বীনি ডাক্তার যে নেই একেবারেই তা না। আছেন, তবে অনেক,অনেক কম। আর **Exception can't never be an example**

প্রশ্ন - শুধু ৫ টা বছর পড়ে নাও, চাকরি করতে হবে না।

জবাব - মেডিকেলে এমবিবিএস ডাক্তার এর কোনো দাম নাই। এখানে ডিগ্রি লাগে সাথে পাওয়ার ও লাগে। যদি ধরে থাকেন ৫ বছর পড়ে অনেক ভালো ডাক্তার হয়েছেন, এখন ঘরে চেম্বার দিয়ে দিবেন। এখানে মহিলা, শিশু রোগী দেখলেন। ধরুন একজন মহিলার ক্যান্সার। এখন আপনাকে তাকে বিভিন্ন টেস্ট করাতে হবে। এই যে ক্লিনিকের ইস্যু বা অন্যান্য কিছু আপনি তো আলটিমেটলি কিছু করতে পারছেন না। তার পর্দা রক্ষা করতে পারছেন না। তাকে টেস্ট করাতে হবে ছেলেদের কাছে, ট্রিটমেন্ট নিতে হবে, সার্জারি করবে স্যাররাই। তাহলে কিভাবে? এটা বলতে সহজ কিন্তু এগুলো কঠিন। আমি এই সেক্টরে আছি তো, এতদিনে বুঝে গিয়েছি কতটা সহজ আর কতটা কঠিন।

প্রশ্ন - সেবা যখন উদ্দেশ্য ফিতনার আশংকা এমনিতেই কমে যাবে।

জবাব - ফিতনার আশংকা কিভাবে কমবে। এখানে বিভিন্ন ডে পালন ইত্যাদি, এরপর মেয়েদের হলেও বেহায়াপনা হয়। এখানে পুরোটা ফিতনা, এত এত অনুষ্ঠান। আপনি হারাম পরিবেশে থাকবেন আর সেখানে ফিতনার আশংখা কমে যাবে নেভার।

স্পিকার বোন:

প্রশ্ন - নববি যুগে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত সাহাবীদেরকে কি মুসলিম মেয়েরা চিকিৎসা দেন নি? (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)

জবাব - আমরা জানি যখন যুদ্ধ কফরযে আইন হয় তখন সেটা বোনদের জন্য ও ফরযে আইন হয়। শরীয়তের সীমারেখায় থেকে বোনদের ও যতটুকু সম্ভব অংশগ্রহণ ফরযে আইন হয়ে যায়। কিন্তু এই মাসআলা গুলো আমভাবে কখনো আমরা ব্যবহার করতে পারি না। ধরুন ওইখানে ময়দানে যদি কেউ চুরি করে সেখানে কিন্তু চুরির শাস্তি (হাত কেটে ফেলা) কায়েম হয় না। ময়দানে কিন্তু হাত কেটে ফেলা হবে না। আপনি যদি স্বাভাবিকভাবে বলেন যুদ্ধক্ষেত্রে তো হাত কেটে ফেলা হলো না চোরের, তাহলে এখন কেন হাত কেটে ফেলবা চোরের? এটা হবে? হবে না। এটা লেইম লজিক। দ্বিতীয় কথা নারী সাহাবীরা পুরুষ সাহাবীদের সেবা দিয়েছেন। এটা মানে কি এটা আমাদের মেডিক্যাল পড়ুয়া আপু যে ফিতনাগুলোর কথা বললেন নারী সাহাবী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা সে ফিতনাগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়েই সেবা দিয়েছিলেন? নাউজুবিল্লাহ, আল্লাহ মাফ করুন। এটা কিন্তু মোটেও না।

প্রশ্ন - আমরা যদি নারী সাহাবীদের মধ্যে আয়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা ও আরেকজন ছিলেন উনারা  মহিলা ডাক্তার হিসেবে খ্যাত ছিলেন। এটা অনেকে বলেন উনারা তো ডাক্তার ছিলেন।

জবাব - আয়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা কিভাবে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা নিয়েছিলেন এতেই আমরা বুঝে যাব। উনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি চিকিৎসাবিদ্যা কিভাবে রপ্ত করেছেন উনি উত্তর করেছিলেন মোটামুটি এমন যে আমি মানুষকে যে চিকিৎসা দেয়া হতো এটা দেখে দেখে শিখতাম। নবী ﷺ যখন শেষ জীবনে অনেক বেশি অসুস্থ থাকতেন এবং আরবের সেরা চিকিৎসকরা নবী ﷺ এর কাছে আসতেন এবং চিকিৎসা দিতেন। আমাদের উম্মুল মু'মিনীন, আমাদের আম্মিজান আয়িশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা দেখতেন, শুনতেন, শিখতেন। উনি এইভাবেই এই বিদ্যা আয়ত্ব করেছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত উনার মেধা সম্পর্কে আমরা সবাই তো অবগত আলহামদুলিল্লাহ। আমার জানামতে উনি কখনো মেডিকেল কলেজে যান নাই, উনি কখনো ফ্রি মিক্সিং পরিবেশে যান নাই, উনি কখনো সহশিক্ষার পরিবেশে যান নাই। আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। আরেকজন আছেন নারী সাহাবী। তার ক্ষেত্রেও একই যুক্তি আমরা দিচ্ছি। তিনি কখনও ফ্রি মিক্সিং এ গিয়েছেন এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং মসজিদে যখন স্বয়ং নবি ﷺ উপস্থিত থাকতেন তখনও নারীদের আগে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলা হতো এবং রাস্তার একদম কোণা ঘেঁষে যাওয়ার কথা বলা হতো। আর সাহাবীরা মসজিদে থাকতেন। কেন ? কারণ কোনোভাবে ফ্রি মিক্সিং এর সম্ভবনাও যাতে না সৃষ্টি হয় এজন্য। চিন্তা করুন, কখন? নববি যুগে। কখন? যখন নবী সাঃ স্বয়ং ছিলেন। কখন? যখন ঈমান টাটকা, মজবুত। অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ। আরেকটা বিষয়, যখন ইমাম সাহেব ভুল করেন তখন পুরুষরা তাসবিহ সহ লোকমা পড়েন, কিন্তু মসজিদেও মহিলাদের তাসবিহ সহ লোকমা দেয়ার অনুমতি নাই।

আরেকটা বিষয়  মালেকী মাযহাবের ইমাম ইবনে আরাবী (রহি) এর মতে এই তথ্য ভিত্তিহীন। বিষয়টা হল, এই সাহাবিয়ার নাম ছিল শিফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা। উনার আসল নাম লায়লা। কিন্তু তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় এতটা মশহুর হয়েছিলেন যে উনাকে শিফা নামে ডাকা হয়, শিফা মানে আরোগ্য। তো কোনো কোনো আলেম বলেন, উনার ছেলে সুলাইমান রহি কেই আসলে উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বাজার পরিদর্শক হিসেবে রেখেছিলেন।

আর শিফা রা: ইসলাম পূর্ব জামানাতেই তিনি চিকিৎসাতে দক্ষ ছিলেন। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণের পরে নবী ﷺ কে বলেছিলেন যে আমি কি এটা চালিয়ে যাব? তখন নবী ﷺ এটা অনুমতি দিয়েছিলেন।

তো আলহামদুলিল্লাহ আশা করছি আপনারা গ্রহণযোগ্য উত্তর পেয়েছেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আপনাদের দেখানো যে মেডিকেল সেক্টরটা আসলে কেমন। তো আপনারা দেখলেন, চিনলেন। যাবতীয় সিদ্ধান্ত আপনিই নিবেন এখন ইন শা আল্লাহ।

এই পর্বে আমরা সহশিক্ষা ছেড়ে দেয়ার গল্প শুনব আমাদের খুব প্রিয় বোনের থেকে।

আলোচনার সারনির্যাস -

১. নিয়ত করব। আমি আসলে কি করতে চাই। জন্ম কেন হয়েছে আমার। আমি যেহেতু রাসূল ﷺ এর উম্মহ আমাদের কিন্তু খাটুনি ঐভাবে দিতে হবে। আমাদের খাটুনী কিসের উপর থাকবে কুরআনের উপর। এখন কুরআন নিয়ে আপনি কি করবেন সেটা একটা বিষয়। চিন্তা ভাবনা করবেন নাকি তর্জমা পড়ে বুঝার চেষ্টা করবেন নাকি শুধু সেখান থেকে জীবনব্যবস্থা নিবেন এটা কিন্তু আপনার উপর। কেন্দ্রবিন্দু কুরআন থাকবে। কুরআন যেহেতু জীবনব্যবস্থা। এজন্য নিয়ত করে নিব আমি যেহেতু এটার উপর থাকতে চাই, এটার উপর থাকতে যা যা বাধা হবে আমি সেখান থেকে দূরে থাকব। এটা নিয়ত করে ফেলব।

২. নিয়ত এর পর নিয়ত অনুযায়ী দুআ করা যে আল্লাহ আমি এটা এটা চাচ্ছি কিন্তু কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না বা আমি পারছি না বা আমাকে পথ দেখিয়ে দাও বা আমাকে এমন সোহবত দাও যারা আমাকে ওইখানে ধরে রাখতে পারবে। কান্নাকাটি করে দুআ করা।

৩. দুরূদ ইস্তিগফার জারি রাখা। খুবই জরুরি এটা।

৪. পরিবারের সদস্যরা আমার সাথে যেমন ট্রিট করুক না কেন, তাদের হক যথাযথ মেইনটেইন করা। তাদের যে দায়বদ্ধতা আছে আমাদের উপর, আখিরাতে যে ফায়সালা হবে সেটা তাদেরকে একটা ধরানো। আমাদের মধ্যে দ্বীনী বুঝ আসার মানে কিন্তু এই না যে আমরা একাই হচ্ছে স্রোতের বিপরীতে চলতে থাকব আমাদের পরিবারকে ফেলে রেখে। এটা না কিন্তু। তো পরিবারের প্রতি হক আদায় করে, সুন্নাহ্ অনুসরণ করে তাদেরকে বুঝিয়ে সেলফিশ ভাবে মানে আমি পরিবারের এমন কোনো কথায় সায় দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন

দিব না যে যেখানে কবরে গিয়ে আমাদের জবাবদিহিতা করতে হয়। পাশাপাশি তাদেরকেও ধরিয়ে দিব ব্যাপারটা এখন একজন সদস্য যদি নাকোচ হয় সেক্ষেত্রে কার্যাবলী ভিন্ন হবে কিন্তু চেষ্টা সেম থাকবে।

৫. আদব মেইনটেইন করে ইস্তিকামাতের সাথে আমরা লেগে থাকব। আদব মেইনটেইন করে, সবরের সাথে এই অবস্থা থেকে বের হতে হবে।

৬. কটু কথা তারা বলুক। মানুষের কটু কথায় আমাদের যায় আসবে না। রাসূল এর ক্ষেত্রে কুরাইশরা এরপর চাচা আবু লাহাব তারা যেরকম ছিল আমাদের প্রতি তো সেরকম না যে রুকু দিচ্ছি উপরে এসে উটের নাড়িভুঁড়ি দিয়ে দিচ্ছে। এরকম তো হচ্ছে না I এতটা নিষ্ঠুর যেহেতু নয় সেক্ষেত্রে আমরা সবর অবশ্যই করতে পারি।

৭. ওয়াসওয়াসা হলে কুরআন তিলাওয়াত জারি রাখা। কুরআন হচ্ছে শিফা, হিফাজতে কাজে দিবে।

৮. জেনারেল ছেড়ে দেয়ার পরে সহজ পাথেয় হচ্ছে তাজউইদ নিয়ে কাজ করা বা কুরআন নিয়ে যেকোনো কাজে যুক্ত থাকা। এতে সদকায়ে জারিয়ার একটা ফায়দা দিবে পাশাপাশি জীবন অনেক বদলাবে। সদকায়ে জারিয়ার জন্য কাজে আগ্রহী হলে জীবনের অনেক কঠিন পথ সহজ হয়ে যাবে। একটা টার্গেট এমন রাখতে পারেন আমি যাই করি না কেন, কুরআনের সদকায়ে জারিয়ার কাজ পাথেয় হিসেবে যদি নেই তাহলে আল্লাহ তাআলা সহজ করবেন। আমার জার্নিতে ও এটা অনেক হেল্প করেছে।

সহশিক্ষা ছাড়তে চাইলে:

স্পিকার বোন:

ধরুন আখওয়াতি, আমরা অনেক বেদ্বীন দেখি না যারা গাইরে মাহরাম এর সাথে হারাম সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এদের যদি ঐ পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে না রাজি হয় পরিবার, এরা রীতিমতো অনশন শুরু করে। অন্য জায়গায় বিয়ে তো দূর ঘরের দরজা লাগিয়ে বসে থাকে দুইদিন চারদিন চলে যায়। পরিবারের সাথে কথা বলে না, সুইসাইড এটেম্পট করে। মানে এরা জাস্ট আর কিছুই দেখে না ঐ মানুষটা ছাড়া। এরা এই যে সেক্রিফাইস করে। পরিবারের কটু কথা, সমাজের কটু কথা এগুলোতো বাদই থাক এরা তো নিজের জিন্দেগিটাও ওই মানুষকে ছাড়া চায় না আর। কেন? যদি ঐ মানুষটাকে পাই না, আমার আর কিচ্ছু চাই না। এই হলো তাদের অবস্থা। এই যে সেক্রিফাইসটা উনারা করছেন, উনাদের সবকিছু। কেন করছেন? কারণ একটা হারাম সম্পর্কে যে ইনভলব ছিলেন এটাকে একটা সামাজিক স্বীকৃতি দেয়ার জন্য। সারাজীবন একসাথে থাকার জন্য। জাস্ট এতোটুকুই।

এবার আসি একটা ফরয বিধানের ক্ষেত্রে। ধরুন সালাহ। আপনার পরিবার আপনাকে নামাজ পড়তে দেয় না বা আপনার আম্মু নামাজ পড়তে বসলে মন খারাপ করে 'তুই নামাজ কেন পড়তেছিস? এই জামানায় কেউ নামাজ পড়ে? ছিঃ'

এটা হয়তো আমাদের অধিকাংশের আম্মু বলে না কিন্তু কোনো কোনো আম্মু আসলেই বলে। অধিক মর্ডান আম্মুরা বলে। আজকালের এত মর্ডান মেয়ে হয়ে তুই নামাজ পড়তেছিস। হিজাব পড়তেছিস? ছি! সমাজে আমি মুখ দেখাব কিভাবে। এখন বলুন, এই অবস্থায় আপনার আম্মুর মন খারাপ আপনার জন্য জরুরি হবে নাকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ফরয বিধান আপনার জন্য জরুরি হবে? বলুন,কি জরুরি হবে?

নিঃসন্দেহে সলাত আদায় জরুরি। আপনার আম্মু যত কষ্ট পাক, যত মন খারাপ করুক, আপনার পরিবার যত আপনাকে বাধা দান করুক, আপনার সমাজ আপনাকে জাস্ট কথার ছুরিতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিক আপনার জন্য সলাত ফরয। আপনার আল্লাহ বলেছেন আপনাকে সলাত আদায় করতে। একইভাবে পর্দা ও আপনার জন্য ফরয। আপনার আল্লাহ বলেছেন আপনাকে পর্দা করতে। আর আমরা যদি একটা হাদিস বলি, মোটামুটি এমন যে যেটাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে কিন্তু বান্দা সন্তুষ্ট হবে না সেক্ষেত্রে যদি আমরা আল্লাহকে গুরুত্ব দেই ফলে বান্দা অসন্তুষ্ট হয় তাহলে কোনো না কোনো এক সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই বান্দাসমূহের অন্তর ও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিবেন। আর যদি বিপরীতটা করি অর্থাৎ বান্দাকে গুরুত্ব দেই, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাহলে একসময় ঐ বান্দারা আপনার প্রতি অস্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর আসলে তো আপনি যদি একজন মানুষের জন্য নিজের হৃদপিন্ডটাও কেটে দেন সে কখনো সন্তুষ্ট হবে না, মানুষের ফিতরাতই এমন। তো আপনি যদি আল্লাহকে ছেড়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করা শুরু করবেন তখন আপনি সব হারাবেন। দুনিয়া আখেরাত। আপনার আশেপাশের মানুষ, আপনার আল্লাহ। আপনি আপনার আল্লাহকে হারাবেন। আপনি আপনার আল্লহকে হারাবেন।

আরেকটি কথা হচ্ছে আমরা অনেকেই বলি যে 'আপু আমার পরিবার কখনোই মানবে না, এটা কখনোই হওয়া সম্ভব না। ' বিষয়টি আসলেই কি এমন? শতকরা ৮০ বা ৯০ ভাগ বাবা মা চান আমার মেয়েকে একটু ভালো দেখে বিয়ে শাদী দেই। এর থেকে বেশী কিছু চান না। এই যে বিয়ে ভালো দেখে দেই এটার একটা মাধ্যম হিসেবে উনারা পড়াশুনাটা নেন। যে হ্যা মেয়ে ভালো জায়গায় পড়লে মেয়ের বিয়ের বাজারে দাম বাড়বে। আমার মেয়ে দেখতে শ্যামলা আছে মেয়ে ভালো জায়গায় পড়ুক তাহলে এসব ত্রুটি চোখে পড়বে না। আর মেয়ে যদি চাকরিজীবী হয় তাহলে তো আল্লাহ! বিনা টাকায় নিয়ে যাবে। কোনো যৌতুক দিতে হবে না। বেদ্বীন পরিবারে লিটারেলি এটাই ভাবেন, এর বেশি কিছুই ভাবেন না। এটার প্রমাণ পাবেন আপনারা আপনাদের আব্বা আম্মাকে জিজ্ঞেস করলে। বিশেষ করে আম্মাকে জিজ্ঞেস করলে। তিনি বলেন ' মা বিয়ে টা হয়ে যাক, এরপর তুই পড়িস না পড়িস কোনো কিছু যায় আসে না। তুই যায় মনে চায় তাই কর। ' তার মানে বিয়েটা মেইন রিজন। আপনার পড়াশোনাটা মেইন না। সেকেন্ড আরেকটা অপশন আছে কিছু কিছু বাবা মা চান যে আমার মেয়েটা স্বাবলম্বী হউক, নিজের পায়ে দাঁড়াক। কখনো জরুরত হলে আমাকে ও সাপোর্ট দিবে। এটা হচ্ছে ইকসেপশনাল কেইস। আপনি যদি চান্স না পান আপনার মা বাবা বলবে অন্যটায় ট্রাই করো, কোথাও না পেলে ন্যাশনালে ট্রাই করো। এবার ন্যাশনালে ও না পেলে তাও কোথাও না কোথাও ভর্তি করিয়েই দিবে। ভর্তি হয়ে থাকো। মানুষ কি বলবে, মানুষ জিজ্ঞেস করলে কি বলব যে আমার মেয়ে লেখাপড়া না করে ঘরে বসে আছে। এটা বলা যায়? বাবা মা এতটুকু ভাবে। তারা এতোটুকুই ভাবেন যে আমি তো সমাজে মুখ দেখাতে পারব না।

এবার আমরা কি ভাবি জানেন? আমরা ভাবি আমার হচ্ছে মাজুর। আমরা হচ্ছি অক্ষম। আমরা ভাবি আমাদের পরিবার যেহেতু মানছে না হয়তো আমাদের জন্য সহশিক্ষা হালাল হয়ে যাচ্ছে। এখানে সবচেয়ে চমৎকার হচ্ছে এই যে সহশিক্ষা হালাল করে ফেলা বা নিজেদের মাজুর ভাবা এটা আমরা নিজেরাই সংজ্ঞায়িত করে ফেলি। আমরা কেউ আলেমের কাছে যাই না। আমরা জাস্ট কোনো পোস্ট বা কমেন্ট বক্স দেখে একটা সেড রিয়েক্ট দেই এরপর বলি 'আপু আমার পরিবার কিছুতেই মেনে নিবে না। পরিবার রাজি হবে না।' এখন কথা হচ্ছে আমি কি মেহনত করেছি? একদিনও মাইর খেয়েছি সহশিক্ষা ছাড়ব বলে? বকা খেয়েছি? খেলে কয়দিন বকা খেয়েছি? ১৫ দিন, ২০ দিন, ১ মাস, ১ বছর? আমি যদি বছরের পর বছর চেষ্টা করেও কোনো কূল কিনারা না পাই তাহলে আমি আলেমের সাথে কথা বলব যে আমার এই এই হালত, এখন কি আমার জন্য কোনোভাবে সহশিক্ষা রুখসত (ছাড়) হয়ে গেছে? যদি তিনি বলেন হ্যাঁ, ছাড় দেওয়া সম্ভব। তখন আপনি নিজেকে হিফাজত করে সহশিক্ষাতে থাকতে পারেন। তাহলে আমি নিজেকে মাজুর বলতে পারি যে হ্যাঁ আমি চাই আপ্রাণ ছাড়তে কিন্তু ছাড়তে পারছি না। অথচ আমাদের হালত হচ্ছে আমরা তো মেহনত না করেই বলি এটা সম্ভব না, কোনোভাবেই সম্ভব না।

অনেক স্টুডেন্ট থাকে যারা বসে হয়তো লাস্ট বেঞ্চে কিন্তু প্রত্যেক ক্লাসে ফার্স্ট। তাদের বাবা মা কিন্তু আমাদের বাবা মার চেয়ে সবচেয়ে বেশি আশা রাখে। তারা ভালো ভার্সিটিতে যাবে সবাই জানে। মানে পরীক্ষা এখনো দেয় নাই সে কিন্তু টিচাররা বলতেছে, আশেপাশের সবাই বলতেছে 'আরে তুমি কিসে পরীক্ষা

দিবা?' সে বলতেছে 'আমি এখানে পরীক্ষা দিব। কি যে হবে আল্লাহ জানে।' তারা বলে ' আরেহ চিন্তা কইরো না। তুমি তো চান্স পাবাই।' এধরণের কনফিডেনস পাশের মানুষের আছে সেই স্টুডেন্ট এর প্রতি। ধরুন এই স্টুডেন্টরা যখন কো এডুকেশন (সহশিক্ষা) ছেড়ে দেয় তখন কি হয়? তখন সেই পরিবার কেমন ধাক্কা খায়? ঐ মানুষটা কেমন ধাক্কা খায়? যাদের ব্রেন একটু শার্প তারা কি ভাবে জানেন? আমি তো এই দেশে থাকব না। লিটারেলি তারা এটাই ভাবে আমি দেশের বাইরে চলে যাব। হয়তো অক্সফোর্ড, হার্ভাড এজাতীয় কোথাও গিয়ে রিসার্চ করব। তাদের বিয়ে শাদী নিয়েও খুব ভালো প্ল্যান থাকে না। আমি খুব বেশি মেধাবীদের কথা বলছি। তাদের পিতা মাতার এক্সপেক্টেশন লেভেল ও খুব বেশি হাই থাকে। উনারা ও ভাবে আমার ছেলে, আমার মেয়ে হবে কিছু একটা। এবার ওই মেয়ে মেডিকেল থেকে শুরু করে ভার্সিটি কোনো জায়গায় ভর্তি হয়না বা চান্স নেয় না বা চান্স পায় না তখন আসলে কেমন হয় বিষয়টা? কিভাবে সে সামাল দেয়? কিভাবে সে তার মনকে সামাল দেয়। আপনি চান আকাশে উড়তে আর আপনি দেখলেন ইসলাম আপনাকে ডানা গায়ের সাথে লাগানোর অনুমতি দেয় নাই। মানে আপনি চান রিসার্চ করতে অথচ ইসলাম বলে সহশিক্ষা হারাম। ব্যাপারটা এমন না যে আমি আকাশে উড়তে চাই সেখানে উড়া তো দূর কি বাত আমাকে ডানাটা লাগাতে দেয়া হলো না। তারা নিজেদের মানসিক হালতের সাথে কিভাবে ডিল করে? এই যে ক্রটিটা পরিবার মানে না সেটা খুবই পঁচা কথা। এটা বলে আসলে আমরা নিজেদের সান্তনা দেই। পরিবার মানে। আজকে হউক কিংবা আগামী বছর। আলটিমেটলি না মেনে যাবে কোথায়? আরে আমি ভাত খাবো না মানে খাবো না , আপনি কিভাবে চিবিয়ে দিবেন আমাকে। আমি পড়ব না, সেখানে পরিবার আমাকে কিভাবে পড়াবে? আসলে আমাদের জেদটা নাই।

একটা মানুষ হারাম রিলেশনশিপের জন্য যতটা মেহনত করে তার ১০% যদি আমরা এই ফরযের জন্য মেহনত করতাম তাহলে দেখতেন বাবা মা মানে কিনা। এবার কথা হচ্ছে প্রথমত. আমরা নিজেরা অনেক বেশি শক্ত হবো। অনেক বেশি মানে অনেক বেশি। আর দ্বিতীয়ত. পরিবারকে দাওয়াহ দিব। আপনি যেমন একটা সময় জানতেন না সহশিক্ষা হারাম। পরিবার ও জানে না। আপনার যেমন একসময় মানতে কষ্ট হয়েছিল, পরিবারের ও হয়েছে যখন আপনি প্রথম বলেছিলেন ' আম্মু আমি পড়াশুনা করতে চাচ্ছি না। ' আপনার বাবা-মা অনেক কষ্ট পেয়েছে না?

পরিবারের তো অনেক স্বপ্ন থাকে যখন আপনি জন্মান তখন থেকে। তো তাদের জন্য কষ্ট না? যে আমার সন্তান কোলে পিঠে মানুষ করছি, এতগুলো মাস গর্ভে ধারণ করছি আর সে বলছে বড় হবে না। আমাদের বেদ্বীন পরিবারে এটাই তো বড় হওয়া, এটাই তো ক্যারিয়ার, এটাই তো সাকসেস (সফলতা) তাই না?

তো বাবা-মাকে খুব হিকমাহর সাথে আমরা বুঝাব  ইন শা আল্লাহ তাআলা। আমরা ঘরোয়া তালিমের আয়োজন করতে পারি। আর আমরা কি করি আমরা ফেসবুক, ইনস্টা, ইউটিউব এ অনেক সময় দেই। আমরা কি কখনো আমাদের পরিবারে ঘরোয়া তালিম করেছি? নিজের পরিবারে নামাজ পড়ার কথা বলে? কয়জনকে দেখে ঘরের মানুষ বলে, না এই মানুষটার সামনে গীবত করা যাবে না। আমাদের নিজেদের হালতই তো ঠিক নাই, আমরা শুধু পরিবারের দোষ দেই। আমরা যদি আমাদের ঘরে মেহনত করতে থাকতাম, মেহনত করতে থাকতাম, মেহনত করতে থাকতাম...

নবী করীম ﷺ প্রথমবার কুরাইশদের দাওয়াত দিলেন, উঠে চলে গেল সবাই। আবার দাওয়াত দিলেন। বারবার দাওয়াত দিলেন। তাহলে আমরা কয়বার দাওয়াত দিয়েছি? তাও নিজেদের লোকদের যাদের হক সবচেয়ে বেশি। আমরা তাদের দাওয়াত দেই না। আমরা দাওয়াত দেই ফেইসবুকে। আমরা কি করি? আমরা দ্বীনি বোনদের সাথে আড্ডা দেই, হাসি তামাশা করি। সারারাত। এরপর সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমাই। তাই আমাদের দৃষ্টিতে যেটা দ্বীনে ফেরা, আমাদের পরিবারের মানুষরা দৃষ্টিতে সেটা বখে যাওয়া। তারা ভাবে এই মেয়ে তো বখে গেছে, এই মেয়ে সারা রাত মোবাইল টিপে, সারাদিন ঘুমায়। এটা কোনো লাইস্টাইল হলো? কিন্তু এটাই আমাদের লাইফস্টাইল। আমাদের কয়জন বোন ঘরের কাজে আম্মুকে সাহায্য করেন। কয়জন আছেন রান্না পারেন? কয়জন সংসার সামলাতে পারি? পরিবারকে  কতক্ষণ টাইম দেন? আমাদের নাকি পরিবার বুঝে না!

আপনার আম্মা আপনার সাথে ফ্রিলি মিশে? কখনো আম্মাকে জড়িয়ে ধরছেন? কখনো বলছেন: আম্মা, আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি? তো আমরা আমাদের আব্বা আম্মাকে খুব করে খিদমত করব। উনারা হয়তো বেশি কথা বলেন না, ইন্ট্রোভার্ট টাইপের। কখনো বিছানা ঠিক করেছেন, আম্মাকে মশারী টাঙিয়ে দিয়েছেন? এটা করেছেন কখনো? আপনারা চেষ্টাই তো করেন না। কি যে বলেন! আম্মা আব্বা মানেন না!

তো আমরা আমাদের আব্বা আম্মার খিদমত করব, আমাদের পরিবারের খিদমত করব। আমি যে দ্বীনে ফেরার পরে ভালো হয়ে গেছি এটা আমার আব্বা আম্মাকে বুঝাতে হবে। আমি আগে উচুঁ গলায় কথা বলতাম, আমি আগে বদমেজাজি ছিলাম, কথায় কথায় ঝগড়া করতাম এখন আমি উহ পর্যন্ত বলব না। এর মানে আমি দ্বীনে ফিরছি, এর মানে আপনার আব্বা আম্মা বুঝবে যে মেয়ে ভালো হয়ে গেছে।

তাহলে প্রথম কথা, নিজের অবস্থানে অনড় থাকব। আমাকে কেউ সরাতে পারবে না। মানুষ যদি হারাম এর জন্য অনড় থাকতে পারে, আমি কেন ফরযের জন্য অনড় থাকতে পারব না? এটা কোনো কথা হইল? তারপর খিদমত করব দিল থেকে। এরপর হলো দু'আ...

## ক্লোজ ইউর আইজ!

ধরুন আপনি একটা রুমে দরজা লাগিয়ে আছেন। হঠাৎ আগুন লেগে গেল একটা পাশ থেকে। আপনি চিন্তা করুন, ক্লোজ ইউর আইজ। আগুন আপনার দিকে আসছে। আপনার সামনে কোনো রাস্তা নাই। আপনি দরজা খুলতে পারছেন না। আপনি দরজা ধাক্কাছেন, জানালা ধাক্কাছেন। আপনি বারবার ডাকছেন এই কে আছো? কে আছো? আগুন! আগুন! কেউ নাই। আগুন আসছে। আপনি পুরোপুরি অসহায়। কেউ নাই। এই সময়ে আপনি কি করবেন বলতে তো? আপনি এখন চোখ, নাক বন্ধ করে আল্লাহকে ডাকবেন তাই না? আচ্ছা বলেন তো সহশিক্ষা কি আগুনের চেয়ে কম? আগুনের চেয়েও তো বেশি ভয়ংকর। আগুনে মরলে তো গুনাহ নাই, যদি ঈমানের সাথে যাই। কিন্তু সহশিক্ষায় যদি পড়ি, ভার্সিটির পরিবেশগুলো এমন যে দ্বীনদার ভাইয়েরা দ্বীনদার বোনদের সাথে কিছু একটা করে আরকি। তারা একসাথে হাত ধরে হাটে। এই হলো পরিবেশ। এটা কি আগুনের থেকে কম উত্তাপ? আগুন বেশি ভয়ংকর নাকি এই পরিবেশ ভয়ংকর? আপনি নিজেকে এই পরিবেশে ঠেলে দিচ্ছেন। এবার গল্পে ফিরি। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে আর আপনি পাগলের মতো আল্লাহকে ডাকছেন। কারন আপনি জানেন আল্লাহ ছাড়া বাঁচানোর কেউ নাই। তো ধরেন আপনি পরিবারে দাওয়াত দিচ্ছেন, নিজেও শক্ত আছেন। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা পাচ্ছেন না। মাজুর হয়ে গেছেন। তখন ঐ আগুনের রুমে আটকে থাকলে আল্লাহকে যেভাবে ডাকবেন। আচ্ছা বলুন তো, কখনো সহশিক্ষা ছাড়ার জন্য আল্লাহকে ডেকেছিলেন? বা কয়জন সহশিক্ষা ছাড়ার জন্য সালাতুল হাজত পড়েছেন? কয়জন কান্নাকাটি করেছিলেন আল্লাহর কাছে?

“ আল্লাহ আমাকে হারাম থেকে বাঁচাই দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাকে খাস পর্দা করার তৌফিক দাও। আল্লাহ কোনো গায়রে মাহরাম যেন আমাকে না দেখে। আমি যেন কোনো গায়রে মাহরাম না দেখি। আল্লাহ এই নজরের হেফাজত করার তৌফিক দাও। জান্নাতে তোমার দিদার দিয়ে দাও।এই নজর আল্লাহ, গায়রে মাহরাম দেখে দেখে নষ্ট করতে চাই না। এই খিয়ানত করতে চাই না আল্লাহ। আমি কিভাবে এই গুনাহগুলো সহ্য করব? এই গুনাহগুলো সহ্য করার ভার তো আমার নাই রব। ”

বলেছেন কখনো এভাবে?

বিশ্বাস করুন আল্লাহকে ডেকেছেন অথচ পান নাই এটা কক্ষনো হয় না। কক্ষনো হয় না। এটা কুরআনেও আছে সূরা মারইয়ামে, হে আমার রব। আমি তো কখনো আপনাকে ডেকে হতাশ হই নাই। যখন আপনার শিরা উপশিরাগুলো দুআয় হাজির থাকবে ওয়াল্লাহি আপনার দুআ কবুল হবে। ওয়াল্লাহি আপনার দুআ কবুল হবে। ওয়াল্লাহি আপনার দুআ কবুল হবে। আমি গতকালকে একজন নওমুসলিমের ঘটনা পড়ছিলাম। তিনি বলছিলেন আমার দুআ কবুলের ঘটনা এমন, আমি যদি আমার আল্লাহকে বলি,, আল্লাহ আজকে সূর্য পশ্চিম দিকে না উঠে পূর্ব দিকে উঠুক তখন আল্লাহ আমার এই দুআ ও কবুল করবেন। চিন্তা করুন নিজের দুআর প্রতি ইয়াকীন কি উনার। উনি নও মুসলিম। উনার একটা সাক্ষাৎকার পড়ছিলাম। উনি বলেছিলেন দুআ করবেন আল্লাহ যেন আমাকে সেজদারত অবস্থায় নিয়ে যান। আল্লহু আকবার কাবি-র। আমি সাক্ষাৎকার পড়ে শেষে জানলাম উনি মারা গিয়েছেন। কিভাবে জানেন? এশার সালাতে।

সেজদারত হালতে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর সাথে উনার সম্পর্কটা কেমন ছিল! আমাদের দিল এ এমন বিশ্বাস ছিল কখনো যে, ডাকছি যখন আল্লাহ তোমাকে। পাবো না মানে? আমার আল্লাহ না তুমি। আমাকে মহব্বত করো না তুমি? শুনবে না কেন আমার ডাকে তুমি?  ইয়াকীন যদি এই লেভেলের থাকে আল্লাহ শুনবে না কেন? আমার আল্লাহ তিনি।

তাহলে প্রথমে অনড় থাকা, দ্বিতীয়ত পরিবারে খিদমত ও মেহনত করা আর তৃতীয়ত অনেক বেশি দুআ করা। এটা করতে থাকেন এরপর জানাবেন পরিবার মানেন কি না।

## মাজুর হালত

এবার ধরুন আপনি বাস্তবেই মাজুর। সহশিক্ষা ছাড়ার কোনো অপশনই নাই, আপনাকে বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছে। এই বাধ্যটা কেমন বাধ্য আমি বলি। সূরা বাকারাতে এসেছে, যার সারনির্যাস কিছুটা এমন। ধরুন আপনি একটা মরুভূমিতে আছেন। অবস্থা এমন আপনি না খেয়ে থাকলে মরে যাবেন। এমন অবস্থায় আপনি একটা মরা উট পেলেন। মরা উট হারাম তাই না? আমার জন্য হারাম কারণ আমি বাসায় আছি, অন্যান্য খাদ্য খেতে পারব। অন্যান্য বোনদের জন্য ও হারাম। কিন্তু আপনি মরুভূমিতে আছেন। এটা হালাল হবে ঐ মুহূর্তের জন্য (শুধুমাত্র আপনার জন্য)। তখন আপনি খেলেন, শক্তি পেলেন। হাঁটা শুরু করলেন। একটা বসবাসযোগ্য ভূমিতে আসলেন। ওইখানে আপনাকে উট ভুনা

করে দেয়া হলো, আল্লাহর নামে জবেহ করে। এখন বলেন তো আপনি কি ঐ উট ভুনা খাবেন নাকি মরা উট খাবেন? এটা তো একটা বোকা ও জানে যে সে আর মরা উট খাবে না। কারণ মাজুর হালত শেষ হয়ে গেছে। এখন আপনি উট ভুনা খাবেন। এইবার বলুন তো আপনার মাজুর হালত সৃষ্টি হলে, মাজুর হালত যখন শেষ হয়ে যাবে সেই মুহূর্ত থেকে আপনার জন্য সেই খাবারটা ও হারাম হয়ে যাবে না? আর  আমাদের জন্য যারা ঐ পরিস্থিতিতে নেই তাদের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম না?  দ্বিতীয়ত আপনি মরা উট যে খেয়েছেন, এখন আমাদের কাছে ফিরে আসার পরে কি আপনি বলবেন " আরে ভাই মরা উট খাইছিলাম। সেই স্বাদ। " এমন বলবেন? আপনি কখনো সেটার স্বাদ বর্ণনা করবেন না। বরং কুন্ঠিত হবেন। আর তৃতীয়ত আপনি চেষ্টা করে যাবেন যে কোথাও কোনো ভালো খাবার পাই কিনা। তাহলে প্রথম কথা হলো আপনি অক্ষম। আপনার জন্য হালাল হলো মানে আমাদের জন্য হালাল হলো না। সেকেন্ড কথা হচ্ছে আপনি সেখানে কোনো স্বাদ পান নি বরং আরো বিষাদ সহ্য করেছেন। আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছেন। আর থার্ড অন আপনি হারাম খাওয়া থেকে বের হতে চাইবেন যদিও আপনার জন্য জায়েজ ছিল ঐ পরিস্থিতিতে। কিন্তু সবসময় আপনি মরা উট খাইতে চাইবেন না। আর সবসময় মরা উট খাওয়াটা আপনার জন্য জায়িয ও হবে না।

এবার সহশিক্ষায় কি হয়?

যারা মাজুর (এটা আলেমরা বলবে, আমার পরিবার মানছে না তাই আমি মাজুর হয়ে গেলাম ব্যাপারটা এমন না। ধরুন একটা-ই মেয়ে, বাবা প্যারালাইসড, মা

বৃদ্ধা। ইনকামের সোর্স নাই। এখন এই মেয়ে যদি সহশিক্ষায় যায়, চাকরি করে এটাকে বলে মাজুর)। তো ধরুন আপনি মাজুর। আপনি সহশিক্ষার পরিবেশে থাকলেন। এবার বলুন তো আপনার জন্য সাময়িক সময়ের জন্য সহশিক্ষা জায়েজ হলো কিন্তু আমার জন্যও কি হলো? আপনার পাশের আরেক বোনের জন্য ও হলো? না, হলো না। আর সেকেন্ড অন, আপনি যেমন মরা উট এর স্বাদ বর্ণনা করেন নাই আমাদের কাছে তেমনি সহশিক্ষার স্বাদ বর্ণনা করা যাবে? না, যাবে না। অথচ আমরা আল্লাহই জানেন কেমন মাজুর। আমরা গর্ব করে বলে বেড়াই অমুক জায়গায় তমুক জায়গায় 'আমি এখানে পড়ি। পরিবেশ অনেক ভালো। নামাজ পড়ার জায়গা আছে।' আরে আপনি ফ্রী মিক্সিং এ আছেন। এখানে নামাজ পড়ার জায়গা থাকলেও এটা ফ্রি মিক্সিং। নামাজ পড়ার জায়গা না থাকলেও এটা ফ্রি মিক্সিং। আমরা যেটা করি, আমরা সহশিক্ষার স্বাদ ও বর্ণনা করি।

এবার থার্ড অন, আপনি কি ওই মরা উট সারাজীবন খেয়েছিলেন? না, বরং আপনি হালাল খাবার খুঁজেছিলেন। কিন্তু সহশিক্ষায় আমরা কি করি, কোনো কারণে মাজুর থেকে ঢুকেছিলাম এরপর এটা কন্টিনিউ করতেই থাকি। মাজুর হালত তো একটা সময় শেষ হয়ে যায় তাই না কিন্তু আমরা মাজুর হালত থেকে বের হতে চাই না। আমরা আজীবন মাজুর হালতে থেকে যেতে চাই। অথচ আপনাকে সহশিক্ষা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা জারি রাখতে হবে।

বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উপর যখন কুরাইশরা অত্যাচার করছিল, মরুভূমির মাঝে রোদের মধ্যে উত্তপ্ত বালুতে রেখে দিয়ে বলছিল লাত আর উযযাকে প্রভু হিসেবে স্বীকার কর। উনার জন্য কিন্তু আপাতত সুযোগ ছিল যে

অন্তরে ঈমান রেখে, ওই অবস্থায় বাহ্যিক ভাবে এতটুকু বলা। বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কি বললেন? আহাদ আহাদ আহাদ। উনার জন্য কিন্তু সুযোগ ছিল, উনি মাজুর ছিলেন। উনি বাস্তবিকই মাজুর ছিলেন। উনি কিন্তু ছাড় নেন নি। উনি আজিমাত (সর্বোত্তম) নিয়েছেন। উনি সর্বোত্তম এ আমল করেছেন। তিনি সেই সাহাবী যাকে নবী ﷺ বলেছিলেন আচ্ছা বিলাল তুমি কোন আমল করো? জান্নাতে আমার আগে আগে আমি তোমার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছিলাম। উনি সেই সাহাবী যিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। নবী ﷺ এর মুয়াজ্জিন! উনি কিন্তু ছাড় নেন নি।

আমরা আপনাদেরকে ছাড় না নিতে বলছি না। এটা তো যার যার ঈমান, তাকওয়ার উপর নির্ভর করে। আমরা এতটুকু বলছি আপনি ছাড় নেয়ার জন্য যোগ্য কিনা? আপনার হালত আসলেই বিলাল (রাযিয়াল্লহু আনহু) এর মতো কিনা? এটা তো অন্তত তাহকিক (যাচাই) করে নিন উখতি। নিজেকে আর কতটা ধোঁকা দিবেন আসলে?

## সহশিক্ষা ছেড়ে দিয়েছি এখন আমরা কি করব?

পড়াশুনার দুইটি ভাগ: একটা দ্বীনি, আরেকটা দুনিয়াবি। দুনিয়াবি পড়াশুনার ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র দুনিয়াবি উপকারী ইলমটুকু নেয়ার দরকার আছে। দুনিয়াবি ইলমের ক্ষেত্রে একটা ধরুন মেডিকেল। আপনি যদি আসলেই এমন কোনো রাষ্ট্রে যেতে পারেন যেখানে ফ্রি মিক্সিং নেই, বাস্তবে পর্দা হিফাজত করে পড়াশুনা করতে পারবেন তাহলে এটা অবশ্যই খুবই আহাম হবে যে আপনি

মেডিকেল সেক্টরে গেলেন এবং মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। এবার আসি দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রে, এটা আসলে মূল কথা। আমরা যদি সাহাবী সাহাবিয়া, তাবেঈদের দেখতে যাই তারা কি দুনিয়াবি ইলমের পিছনে ছুটে ছিলেন? তাদের শুধুই দ্বীন ছিল। দুনিয়াটা জাস্ট আখিরাতের জন্য। দুনিয়ায় কাজ করে যাতে আখিরাতে জান্নাত পাই। আমাদের মেয়েদের জান্নাত ৪ টা জিনিসে - এক. সালাত (নামাজ), দুই. সাওম (রোজা), তিন. লজ্জাস্থানের হিফাজত (পর্দা), চার. স্বামীর আনুগত্য। এই চারটি জিনিস করলেই আমি জান্নাত পাচ্ছি। তাহলে আমি কিসের পিছনে দৌড়াচ্ছি?

দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রে -

• ফরযে আইন ইলম (তাজউউদ, ফিকহ ,আকিদা) পাকা করে নিব।

• এরপর তাজউইদের জন্য হায়ার লেভেলের পড়াশুনা করতে পারি, একটা হচ্ছে ফরয পরিমাণ পড়াশুনা। আরেকটা হায়ার লেভেলের পড়াশুনা। আমরা সেগুলো করতে পারি।

• পাশাপাশি নাজেরা কন্টিনিউ রাখা।

• এরপর হিফজ করলেন। (এর আগে আরবী ভাষা শিখে নিলে হিফজের মজা অনেক বেশি পাওয়া যাবে)। কুরআন ক্বলবে থাকা অনেক বড় নিয়ামত। কুরআন হিফজ হলে আপনি সারাক্ষণ কুরআনের সাথে থাকবেন। কুরআন হিফজ থাকলে রমাদ্বানে তারাবীহতে চ্যালেঞ্জ নিয়ে ফেলতে পারবেন 'দেখি আজকে খতম দিয়ে দিতে পারি কিনা।'

• এরপর পরিবারকে দাওয়াহ দেয়া।

এগুলোর পাশাপাশি আরো অনেক কিছু আছে। যাই হোক আজ এ পর্যন্ত ই ইন শা আল্লহ।

আমাদের জন্য দু'আ করবেন। ভুল ত্রুটি মাফ করে দিবেন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

বি:দ্র: আল্লহর অশেষ রহমতে উক্ত মুযাকারাটি আয়োজন করা হয়েছিলো 'মুহাব্বাতে কুরআন' এর পক্ষ থেকে।

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক:
https://t.me/+YJpUNV3-0Y1kOGNl

উল্লেখ্য:
১। আমাদের সকল কার্যক্রম শুধুমাত্র বোনদের জন্য। চ্যানেলেও তাই শুধু বোনেরা যুক্ত হবেন ইন শা আল্লহ।
২। আমাদের ফেসবুক বা অন্য প্ল্যাটফর্মে কোনো পেইজ/চ্যানেল নেই।